মানভুম - ঐতিহ্যের অনুসন্ধানে

— ড. ভীমসেন মাহাতো

দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত রাঢ়ে ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে (Regulation XVIII of 1805) ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ২৩টি পরগনা ও মহল নিয়ে 'জঙ্গলমহল' জেলা গঠন করে। এই ২৩টি পরগনা ও মহলের মধ্যে ১৩টি নেওয়া হয় পাঁচেট সহ বীরভুম থেকে। কোতুলপুর বাদে শেনপাহাড়ি, শেরগড় এবং বিষ্ণুপুরকে বর্ধমান থেকে নেওয়া হয়। আর ছাতনা, সুপুর, অম্বিকানগর, সিমলাপাল, ভালাইডিহা, বরাহভুম ও মানভুম - মোট ৭টি পরগণা ও মহল নেওয়া হয় মেদিনীপুর থেকে। নতুন এই জেলার প্রশাসনিক সদরকেন্দ্র ছিল বাঁকুড়ায়।[১]

ইতিহাসের সূত্রে জানা যায় যে, নবাব মির জাফর আলি খাঁর রাজত্বকালে বাংলার সর্বত্র অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়েছিল। রাজকোশের অর্থও কমে আসে। এর ফলে বিদ্রোহ দেখা দেয় সেনাদের মধ্যে। কোম্পানিও নবাবের ওপর আর আস্থা রাখতে পারেনি। তাঁকে সরিয়ে দিয়ে বাংলার মসনদে নতুন নবাব বসানোর কথাও চিন্তা করে। এই মর্মে ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দের ২৭ সেপ্টেম্বর মির কাশিম আলি খাঁর সঙ্গে তাদের গোপনে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তাতে সুবা বাংলার পরবর্তী নবাব হওয়ার জন্য তাঁকে সেনাবাহিনী দিয়ে সাহায্য করবে কোম্পানি। বিনিময়ে সেনাবাহিনীর খরচ চালাতে বর্ধমান, মেদিনীপুর এবং চট্টগ্রাম চাকলার রাজস্ব আদায়ের অধিকার নবাব মির কাশিম আলি খাঁ তাদের ছেড়ে দেবেন।[২] এরপর ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট শাহ আলমের কাছ থেকে কোম্পানি বাংলা, বিহার ও ওড়িশার 'দেওয়ানি সনদ' লাভ করে। মেদিনীপুরে এই সময়ে নিযুক্ত রেসিডেন্ট ও সমাহর্তা ছিলেন জন গ্রাহাম এবং তার পরে ভ্যানসিটার্ট। তাঁদের আদেশে লে. ফার্গুসন সম্পূর্ণ জঙ্গলমহল এলাকাকে কোম্পানির অধীনে আনতে ১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে সামরিক অভিযান চালান। মোটামুটি এক বছরের মধ্যেই তিনি মানভুম এবং বরাহভুমের বিদ্রোহী সর্দার ও জমিদারদের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করান। এঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে প্রজাদের বিষাক্ত তিরে ইংরেজ পক্ষের বহু সেনা মারা যায়। এই সময়ে ঘাটশিলার নবনিযুক্ত রাজা জগন্নাথ ধলের নেতৃত্বে জঙ্গলসর্দার ও তাঁর পাহাড়িয়া এলাকার প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। কোম্পানির সঙ্গে যুদ্ধে তিনিও পরাস্ত হন। ১১৭৬ খ্রিস্টাব্দে (১৭৬৯-৭০খ্রিস্টাব্দে) সারা বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ নেমে আসে। অনাহারে রোগে অসুখে মারা যায় এক কোটির মতো মানুষ। জঙ্গল এলাকায় এই মন্বন্তর গুরুতর আকার ধারণ করেছিল। সেই সঙ্গে বলবৎ ছিল কোম্পানির রক্তচোষা রাজস্বনীতি ও দানবীয় শাসন। ফলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে এলাকার সমস্ত

জমিদার, সর্দার, পাইক ও চুয়াড় প্রজাদের বিদ্রোহী করে তুলেছিল। এই সময়ের প্রশাসনিক কাগজপত্র থেকে জানা যায় যে, বর্ধমানের রেভেনিউ বোর্ডের আদেশ অনুসারে ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে মেদিনীপুর চাকলার সমস্ত জমিদারদের জন্য একটি 'mockurary'র ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়।[৩]

এরপরেও সাধারণ মানুষের ওপর ইংরেজ কোম্পানির শোষণ জুলুম উৎপীড়ন ক্রমশ বাড়তে থাকে। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ভূমি ও ভূমিরাজস্বনীতি[৪] সমস্ত জঙ্গল-জমিদার, পাইক-প্রজাদের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলেছিল। পাইকানদের নিষ্কর জমি রাজস্বের আওতায় নিয়ে আসা হয়। বাড়িয়ে দেওয়া হয় প্রজাদের করের বোঝা। জমিদারিতে নিলামের ব্যবস্থা চালু করা হয়। পূর্বের জমিদার এবং তাঁদের পাইকদের অনেকেই বঞ্চিত হলেন বংশপরম্পরায় প্রাপ্ত জমির অধিকার থেকে। তাঁদের পরিবর্তে এলাকার শিকড়মাটির সঙ্গে সম্পর্কহীন কোম্পানির অনুগ্রহপুষ্ট কিছু তাঁবেদারকে বসিয়ে দেওয়া হয়। জঙ্গল অঞ্চলের জমিদার, পাইক ও চুয়াড় প্রজাদের কেউই মেনে নিতে পারেননি ইংরেজের এই চণ্ডনীতি। ফলে আঠারোশো শতাব্দীর শেষের দু-তিন বছর বিদ্রোহের দাবানল রাইপুর ও তার সন্নিহিত অঞ্চলগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দের মে মাসের গনগনে রোদে এই বিদ্রোহের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। নেতৃত্ব দেন রাইপুরের প্রাক্তন জমিদার দুর্জন সিংহ। রাইপুরের সাজানো জমিদারের বাড়ি ও কাছারি লুঠ করে নেওয়া হয়। জমির লোভে এলাকায় বাস করা নতুন রায়তদের গ্রামগুলিতেও চলে লুণ্ঠনের ঘটনা। ইতিহাসের সূত্রে জানা যায় যে, ১৫০০ জন পাইক ও চুয়াড়-প্রজা এই বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেছিলেন।[৫] এই কাজকর্মে বাধা দিতে গিয়ে অনেক ইংরাজ বরকন্দাজ ও সিপাই মারা যায়। সাধারণ প্রশাসন ও পুলিশ ব্যর্থ হয় এই বিদ্রোহ দমনে। বিশাল সেনাবাহিনী নামিয়ে তখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ব্যাপক ধ্বংসলীলা এবং বীভৎস নরহত্যা চালায়। বিদ্রোহী মানুষের রক্তের স্রোতে ভেসে যায় বিস্তীর্ণ জঙ্গলমহলের মাটি। বহু প্রচেষ্টায় এই বিদ্রোহ দমন করা হলেও প্রত্যন্ত জনপদগুলিতে এর রেস কিন্তু দীর্ঘকাল থেকে যায়। অন্যদিকে শাসক ইংরাজও দমনের এই দানবীয় পথ পরিহার করে। পরিবর্তে নিজ নিজ অঞ্চলের জমিদারদের হাতে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার কিছুটা দায়িত্ব দেওয়ার কথা ভাবে। বিদ্রোহী পাইক এবং চুয়াড় সর্দারদের বিভিন্ন সরকারি চাকরি, পুলিশ ও প্রশাসনের নানা পদে যুক্ত করার প্রলোভনও পাশাপাশি চলতে থাকে। কোম্পানি এও বুঝতে পারে যে, রাজস্ব বাকি পড়ার কারণে জমিদারি নিলামের মতো স্পর্শকাতর ঘটনা যখন তখন ঘটানো হলে তাতে খারাপ ছাড়া ভালো কিছুই হবে না।

এইভাবে সরকারি প্রলোভন ও সঙ্গে সঙ্গে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার প্রসিদ্ধ কূটকৌশল প্রয়োগ করে কোম্পানি জঙ্গলমহল এলাকায় সাময়িক শান্তি নিয়ে আসার চেষ্টা করে। তা সত্ত্বেও জানা যায় যে, পাঁচশো বিদ্রোহী চুয়াড় মানবাজার শহরে ব্যাপক লুঠপাঠ চালান। বরাহভুমের জঙ্গলসর্দার লাল সিংহের নেতৃত্বে প্রায় তিন হাজার বিদ্রোহী

বরাহভুম থেকে বীরভুমের সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে বিদ্রোহী কাজকর্ম চালু রাখায় বিরাট চাপের মুখে পড়ে যায় কোম্পানি। তাই প্রশাসনিক প্রয়োজনে তারা ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে 'জঙ্গলমহল' জেলা গঠন করে। ভয়ংকর প্রকৃতির একজন ইংরেজকে এই জেলার শাসনকর্তার পদে বসানো হয়। কড়া শাসন ও সাহেবদের পাশাপাশি থাকার প্রলোভনে পড়া কিছু পাইক-সর্দারের সাহায্যে কোম্পানি এই এলাকাকে আস্তে আস্তে শান্ত করে ফেলে। এই সময়েই বরাহভুমের রাজা বালক নারায়ণ মারা যান। তাঁর উত্তরাধিকারী নির্বাচনের মতো স্পর্শকাতর বিষয়ে কোম্পানি জড়িয়ে পড়ায় রাজা বালকের পাটরানির ছেলে গঙ্গানারায়ণের নেতৃত্বে ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে আবার ভূমিজবিদ্রোহ দেখা দেয়। ইতিহাসে এই ঘটনাকে 'গঙ্গানারায়ণ হাঙ্গামা' নামে উল্লেখ করা হয়েছে।[৬] এই বিদ্রোহ দমন করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয় ইংরাজকে। ইতিহাসের নানা তথ্যপ্রমাণাদি সূত্রে জানা যায় যে, ১৭৬৭ থেকে ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কোম্পানিকে জঙ্গলমহল অঞ্চলে বহুবার সশস্ত্র বিদ্রোহের সম্মুখীন হতে হয়। ব্যাপক প্রাণহানি ঘটে। অনেক ইংরাজ সেনাও মারা যায়। বিনিময়ে কোম্পানি এই এলাকায় তার একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠা করে।

'গঙ্গানারায়ণ হাঙ্গামা'-র কারণে জঙ্গলমহলের প্রশাসনিক বিষয় নিয়ে কোম্পানি নতুন করে ভাবনা চিন্তা শুরু করে। এই বিদ্রোহ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে দমন করেন মিস্টার ডেন্ট। সমগ্র বিষয়টি তিনি নতুন করে পর্যালোচনা করে দেখেন। 'জঙ্গলমহল' জেলাটি একটি প্রশাসনিক চৌহদ্দির মধ্যে থাকার দরুন জেলার সমস্ত জঙ্গল-সর্দারদের একত্রিত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিল বলে তিনি মনে করেন। বরাহভুমের যুবরাজ গঙ্গানারায়ণের বিদ্রোহ শক্তিশালী হয়ে ওঠার পেছনে এটি ছিল একটি অন্যতম কারণ। সুতরাং, জঙ্গলমহল জেলা ভেঙে দেওয়ার কথা ভাবা হয়।[৭] প্রকৃত প্রস্তাবে জেলাটির ভৌগোলিক এবং প্রশাসনিক দিক থেকে অনেক অদল-বদল করা হয়। সিংভুমের উত্তর ও মেদিনীপুরের পশ্চিম অঞ্চলের কিছুটা অংশ বাদ দেওয়া হয় এই জেলা থেকে। শেনপাহাড়ি, শেরগড় ও বিষ্ণুপুর – এই তিন এলাকাও আর জেলার মধ্যে থাকল না। জেলার অবশিষ্ট এলাকাকে নিয়ে ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে (Regulation XIII of 1833) কোম্পানি দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত এজেন্সি গঠন করে। এজেন্সির প্রশাসক নিযুক্ত হন গভর্নর জেনার‍্যালের একজন প্রতিনিধি। 'জঙ্গলমহল' জেলা গঠনের আটাশ বছরের মধ্যেই তার বিলুপ্তি ঘটে। সাময়িকভাবে এই এজিন্সিকে জুড়ে দেওয়া হয় পাশের জেলা রামগড়ের সঙ্গে। সামরিক ধাঁচের শাসনপ্রণালী এখানে চালু করা হয়। কোনো দেওয়ানি আদালতের বিচারব্যবস্থা থাকল না। গভর্নর জেনারেলের প্রতিনিধিই ছিলেন এই এজেন্সির একমাত্র দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তিনিই অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিতেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানোর কোনো অধিকার সাধারণ মানুষের ছিল না।

Section V Regulation of 1833 অনুসারে এই দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত এজেন্সিই 'মানভুম'জেলা রূপে পরিচিতি পায়। প্রশাসনের সদরদপ্তর প্রথমে ছিল মানবাজারে।

পাঁচ বছর পর ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে জেলাপ্রশাসনের সদর দপ্তর পুরুলিয়ায় নিয়ে আসা হয়। কারণ পুরুলিয়ার অবস্থান ছিল এই জেলার মাঝখানে।[৮] একত্রিশটি জমিদারি এলাকা। আয়তন হল ৭,৮৯৬ বর্গমাইল। ১২বছর পর ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে ধলভুমকে সিংভুমের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে কোম্পানি আর-একটি নতুন জেলা 'সিংভুম' গঠন করে। এই দুটি জেলার গঠন ও তাদের সীমানা-বিন্যাসের পেছনে কোনো অর্থনৈতিক বা সাংস্কৃতিক মানদণ্ড ছিল না। জেলা দুটির মানুষের মধ্যে সম্প্রদায়গত ভিন্নতা থাকলেও তাঁদের ভাষা, আচার-আচরণ এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে পারস্পরিক নৈকট্যই ছিল সব চাইতে বেশি। কেবল মাত্র প্রশাসনিক সুবিধার কারণেই এই দুই জেলাকে আলাদা আলাদা করে গঠন করা কোম্পানির মূল উদ্দেশ্য ছিল। জেলা দুটির রাজস্ব নির্বিঘ্নে আদায়ের স্বার্থেই প্রশাসনিক দিক থেকে অধিবাসীদের বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়, যাতে তাঁরা একত্রিত হয়ে আর কোনো দিন মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারেন। উদ্দেশ্য অনেকটাই সফল হয়। এবার জেলাটিকে স্থায়ী করার দিকে নজর দেয় কোম্পানি। এর জন্য প্রণীত হয় নতুন আইন (Act XX of 1854)। ফলে এলাকায় কিছুটা স্বস্তি আসে। সামরিক ধাঁচের প্রশাসনের পরিবর্তে অসামরিক প্রশাসনের আওতায় আসে জেলাটি। ছোটোনাগপুরের কমিশনারের অধীনে অন্তর্ভুক্ত করা হয় মানভুমকে। গভর্নর জেনারেলের প্রতিনিধির পদটিকেও এই সঙ্গে উন্নীত করা হয়। তিনি হন এই জেলার ডেপুটি কমিশনার।[৯] এর আগে ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দের শেষাশেষি কোম্পানি এই জেলার উত্তরাঞ্চলে 'গোবিন্দপুর' মহকুমা প্রতিষ্ঠা করে। আয়তন ৮০৩ ব মা। এই মহকুমাই পরবর্তীকালে 'ধানবাদ মহকুমা'-তে নামান্তরিত হয়।[১০]

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সিপাহি বিদ্রোহের সময় সারা দেশের সঙ্গে মানভুম জেলাও শান্ত ছিল না। পুরুলিয়া সদরে নিযুক্ত রামগড়-ব্যাটেলিয়নের ৬৪ জন সেপাই ও ১২ জন সওয়ার কোম্পানির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। ৫ আগস্ট জেলার ট্রেজারি থেকে এক লক্ষেরও বেশি টাকা লুঠ করেন তাঁরা। জেলখানায় দুশো থেকে তিনশো কয়েদি ছিল। জেল ভেঙে তাদের মুক্ত করে দেওয়া হয়। এই সময়ে ঝাইলদার রাজা হাজারিবাগ জেলে বন্দি ছিলেন। বিদ্রোহের ঢেউ পৌঁছোয় সেখানেও। বিদ্রোহীরা তাঁকেও মুক্ত করে দেন। অন্যদিকে পাঁচেট রাজপরিবারের একজন সদস্য মুক্ত কয়েদিদের সংগঠিত করতে থাকেন বলে জানা যায়। আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় রঘুনাথপুর কোর্টে। নথিপত্র সব পুড়িয়ে ফেলা হয়। ডেপুটি কমিশনার ক্যাপ্টেন জি. এন. ওকস এই বিষয়ে পাঁচেটের রাজা নীলমণি সিংহ দেও-এর কাছে সাহায্য চেয়ে ব্যর্থ হন। সমূহ বিপদ দেখে ওকস সপার্ষদ রানিগঞ্জে পালিয়ে যান। এক মাস পরে বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে ফিরে এসে জেলার সংশ্লিষ্ট বিদ্রোহীদের কড়া হাতে দমন করেন। ব্রিটিশবিরোধী উত্তেজিত সাঁওতালদের অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সংগঠিত করার অভিযোগ ওঠে রাজা নীলমণির বিরুদ্ধে। তাঁকে বন্দি করে কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের মার্চের আগে তিনি মুক্তি পান।[১১]

১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ধারাবাহিক বিদ্রোহ করার ফল মানভূমের মানুষ হাতে হাতেই পেতে থাকে। চলতে থাকে মানভূমকে খণ্ডবিখণ্ড করার খেলা। দামোদর ও বরাকর-সংলগ্ন পাণ্ড্রা অঞ্চলকে কেটে বর্ধমান জেলার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে। মহিষাড়া ও ছাতনাকে বাঁকুড়ার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। মানভূমকে কাটছাঁট করার নিষ্ঠুর পরিকল্পনা থেকে কোম্পানি কিন্তু এখানেই থেমে থাকল না। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দের ২৭ সেপ্টেম্বরের এক সরকারি আদেশে সুপুর, রাইপুর, অম্বিকানগর, সিমলাপাল, ভালাইডিহা, ফুলকুসমা ও শ্যামসুন্দরপুর – এই সাতটি পরগনাকে বাঁকুড়ার সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার পর ১৮৮১ খৃস্টাব্দে কোম্পানি 'বাঁকুড়া' নামে আর -একটি নতুন জেলা গঠন করে। প্রশাসনিক কারণেই সিংভুমের মতো এই জেলারও জন্ম হয়। ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত, এই ৪৬-৪৭ বছরের মধ্যে মানভুম জেলা প্রায় অর্ধেক আকার ধারণ করে। আয়তন দাঁড়ায় ৪,১৪৭ বর্গমাইলে। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে আরও একবার মানভুমকে টুকরো করার প্রস্তাব নেওয়া হয়। এই জেলার গোবিন্দপুর মহকুমাকে বর্ধমানের রানিগঞ্জ মহকুমার সঙ্গে জুড়ে দিয়ে কোম্পানির আর-একটি নতুন জেলা গঠন করার ইচ্ছা ছিল। এই সময়ে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের জ্বলন্ত প্রস্তাবটি কোম্পানির সামনে চলে আসে। এর বিরুদ্ধে উত্তাল হয়ে ওঠে বঙ্গের রাজনীতি। এই পরিস্থিতিতে মানভুম-বিভাজনের ওই প্রস্তাব কার্যকর করতে কোম্পানি আর উদ্যোগ নেয়নি।[১২] ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ২০ জুলাই বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হলে এর প্রতিবাদে সারা বাংলার গ্রাম এবং শহর অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনেও এই ঘটনা গুরুতর প্রভাব ফেলে। লর্ড কার্জনের বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করার সিদ্ধান্তটি যে, মোটেই সঠিক ছিল না তা অচিরেই বুঝতে পারে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। পরবর্তী কালে লর্ড হার্ডিঞ্জ এবং ভারত-বিষয়ক সচিব লর্ড ক্রিউই বাংলা তথা ভারতের রাজনৈতিক অশান্তির অন্যতম কারণ বঙ্গভঙ্গ নামক গর্হিত কাজ করা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠেন। প্রশাসনিক নিয়ম-কানুন বজায় রেখেই বিকল্প প্রস্তাবও প্রস্তুত করেন হার্ডিঞ্জ। সম্রাট পঞ্চম জর্জ এবং রানি মেরি ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে ভারত সফরে আসেন। এই বছরেই সম্রাট বঙ্গভঙ্গ রদ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। আরও দুটি বিষয় সেই সঙ্গে ঘোষিত হয়। ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় দিল্লিতে।[১৩] আর বিহার, ওড়িশা ও ছোটোনাগপুর নিয়ে নতুন একটি রাজ্য ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের ১ এপ্রিল গঠন করা হয়। বাংলা প্রদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে মানভুমকে জুড়ে দেওয়া হয় এই রাজ্যের সঙ্গে।[১৪]

অনেক বছর ধরে বাংলার সঙ্গে মানভুম ও ধলভুমের নাড়ির যোগ ছিল। দুটি এলাকাই মূলত বাংলা-ভাষাভাষী অধ্যুষিত অঞ্চল। বাংলার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার ঘটনাটিকে দুই এলাকার মানুষ মনেপ্রাণে মেনে নিতে পারেননি। এমনকি তদানীন্তন বিহার প্রদেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে ড. সচ্চিদানন্দ সিংহ, দীপনারায়ণ সিংহ, পরমেশ্বর লাল, নন্দকিশোর লাল ও মহম্মদ ফকরুদ্দিন এই সময়ে তাঁদের যুক্ত বিবৃতিতে মানভুম ও ধলভুম বাংলার সঙ্গেই থাকা উচিত বলে অভিমত

প্রকাশ করেন।[১৫] রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বাংলাভাষা-পরিচয়' গ্রন্থে এ-প্রসঙ্গে একটি মূল্যবান উক্তি করেছেন। - "বাংলাদেশের ইতিহাস খণ্ডতার ইতিহাস। পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ, রাঢ় বারেন্দ্রের ভাগ কেবল ভূগোলের ভাগ নয়; অন্তরের ভাগও ছিল তার সঙ্গে জড়িয়ে, সমাজেরও মিল ছিল না। তবু এর মধ্যে যে ঐক্যের ধারা চলে এসেছে সে ভাষার ঐক্য নিয়ে। এতকাল আমাদের যে বাঙালি বলা হয়েছে তার সংজ্ঞা হচ্ছে, আমরা বাংলা বলে থাকি। শাসনকর্তারা বাংলাপ্রদেশের অংশ-প্রত্যংশ অন্য প্রদেশে জুড়ে দিয়েছেন, কিন্তু সরকারি দফতরের কাঁচিতে তাঁর ভাষাটাকে ছেঁটে ফেলতে পারেননি।"[১৬]

এ-ধরনের ভাষাগত অসঙ্গতি ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও ছিল। জাতীয় স্তরের নেতৃবৃন্দ বিষয়টি জানতেন। মানভুম ও ধলভুমের প্রসঙ্গটিও তাই পরবর্তী কালে আবার ভেবে দেখা হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়। এই সময়ের মধ্যে মানভুমের উত্তরাঞ্চল ক্রমশ শিল্পে সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে থাকে। বাড়তে থাকে মানভুমের মর্যাদা। পরিস্থিতি অনুসারে মানুষের মতিগতিও পালটে যায়। বিহারের মানুষ মানভুম জেলাকে তাদের রাজ্যেই রেখে দেওয়ার জন্য এবার ভেতরে ভেতরে উদ্যোগ নিতে থাকে। ধানবাদ মহকুমার সরকারি রেকর্ড বাংলার পরিবর্তে হিন্দিতে রাখতে হবে – এই মর্মে ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে এক বিজ্ঞপ্তিও জারি করা হয়।[১৭] এই বিজ্ঞপ্তির ফলে ধানবাদ কোর্টের আইনজীবীদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়তে থাকে সাধারণ মানুষের মধ্যেও। অন্যদিকে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের ভাষা ও সংস্কৃতিগত অনুরূপ অভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলি দূর করার জন্য ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে নাগপুর অধিবেশনে ভাষার ভিত্তিতে রাজ্যপুনর্গঠনের দাবির প্রস্তাব প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করে। পরবর্তী কালে অন্যান্য রাজনৈতিক কর্মসূচির সঙ্গে এই দাবিটি বারে বারে ঘোষিত হতে থাকে।[১৮] এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিহারের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আর চুপচাপ বসে থাকলেন না। মানভুমকে বিহারের মধ্যে রেখে দেওয়ার জন্য জেলার সর্বত্র হিন্দিভাষা প্রচারের কাজ যথারীতি তাঁরা শুরু করে দেন। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেস বিহারে মন্ত্রীসভা গঠন করার পর থেকে এই কাজের তৎপরতা আরো বেড়ে যায়। রাজ্য সরকার মূলত আদিবাসী এবং পিছিয়ে পড়া বাংলা-ভাষাভাষী জনজাতি-অধ্যুষিত বহু গ্রামে প্রাথমিক স্তরে হিন্দি ভাষা শেখার জন্য স্কুল খোলার কাজ শুরু করে দেয়। সরকারের এই ঘৃণ্য প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে বাঙালি বুদ্ধিজীবীগণ মানভুমের বাংলা-ভাষাভাষী মানুষকে সংগঠিত করতে থাকেন। নিজেদের সাংস্কৃতিক বিপন্নতার কালো মেঘ দেখে হিন্দিভাষী স্কুলের পাশাপাশি বাংলাভাষী স্কুল খোলার জন্য তাঁরা উদ্যোগী হন। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির মর্যাদা রক্ষার জন্য পত্রপত্রিকা প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যাপক প্রচারের কাজেও তাঁরা নিজেদের সমানভাবে নিযুক্ত করেন।[১৯] বিহার, ওড়িশা ও ছোটোনাগপুর নিয়ে গঠিত যুক্তপ্রদেশ ভেঙে ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে বিহার এবং ওড়িশা নামে দুটি স্বতন্ত্র রাজ্য গঠন করা হয়। ছোটোনাগপুর থেকে যায় বিহারের সঙ্গে। অতীতের ছোটোনাগপুর-

ভুক্তির কারণে এবারও বিহারের সঙ্গেই রেখে দেওয়া হয় মানভুমকে। বিদেশি শাসক ইংরেজকে দেশ থেকে বিতাড়ন করাটাই তখন ভারতের রাজনৈতিক দলগুলির প্রধান এবং একমাত্র কর্মসূচি ছিল। যার ফলে এ-সময়েও মানভুমের ভাষা-সংস্কৃতির সংকটের প্রশ্নটি দেশের অন্যান্য প্রদেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলির মতোই সাময়িকভাবে প্রধান কর্মসূচি থেকে সরিয়ে রাখা হয়। মানভুমের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও এই অভিন্ন কর্মসূচির প্রতি আনুগত্য বজায় রেখে বিহারে থেকেই দেশমাতার মুক্তির কাজে নিজেদের সমর্পণ করে দেন।

অবশেষে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই আগস্ট দেশভাগের মধ্য দিয়ে ভারত স্বাধীন হয়। অখণ্ড বাংলার পূর্বাংশ চলে যায় পাকিস্তানে। বাকি অংশ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ যুক্ত হয় ভারতে। এই সংকটকালে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ পুনর্গঠনের প্রশ্নটি পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে উঠে আসে। ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও এই বিষয়ে আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে তৎকালীন বিহার সরকার এক আগ্রাসী মনোভাবের পরিচয় দেয়। এই সময়ের সরকারি নির্দেশনামাগুলি মানভুম জেলার কংগ্রেস নেতৃত্বকে বিস্মিত করে তোলে। জেলার সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, অফিস ও আদালতে বাংলার পরিবর্তে হিন্দিভাষা চালু করার সরকারি হুমকি দেওয়া হয়। সমগ্র জেলা জুড়ে চলতে থাকে উগ্র প্রাদেশিকতা এবং জাতপাতভিত্তিক সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের এক জঘন্য প্রচার।[২০] এর পেছনে নানা ধরনের প্রলোভনও ছিল বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়। একটা জেলার ভাষা ও সংস্কৃতির জগৎকে শেষ করে দেওয়ার এই কদর্যতা সদ্য স্বাধীন হওয়া জেলার সাধারণ মানুষের কাছে ছিল কল্পনার অতীত। জেলার কংগ্রেস নেতৃত্বও ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে জিতান অধিবেশনে মানভুমের অধিকাংশ মানুষের মাতৃভাষা যে বাংলা - এই বিষয়টি নতুন করে প্রস্তাব গ্রহণ করার উদ্যোগ নেন।[২১] জেলা নেতৃত্বের অকারণ গড়িমসি ও সেই সময়ের রাজনীতির ভেতরের সর্পিল গতিপ্রকৃতি ভালোভাবে উপলব্ধি না করার ফলে প্রস্তাবটি ৫৫-৪৩ ভোটে পরের সভায় বাতিল হয়ে যায়। এই ঘটনার পর সভাপতি অতুলচন্দ্র ঘোষ ও সম্পাদক বিভূতিভূষণ দাশগুপ্তসহ মোট ৪০ জন সদস্য জেলা কমিটি থেকে পদত্যাগ করেন। এঁদেরই ডাকা পাইকবিড়রা অধিবেশন থেকে জেলায় আর একটি গান্ধিবাদী রাজনৈতিক দল 'লোকসেবক সংঘ'-এর আত্মপ্রকাশ ঘটে।[২২] মাতৃভাষার প্রশ্নেই দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায় এই জেলার কংগ্রেস। 'লোকসেবক সংঘ' মানভুমে দ্বিতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ ঘোষণা করে। এর প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। মূলত এই প্রশ্নকে সামনে রেখেই ১৯৫২ সালের সাধারণ নির্বাচনে এই আঞ্চলিক দলটি মানভুম ও তার সংলগ্ন অঞ্চলে জাতীয় কংগ্রেসকে একেবারে কোণঠাসা করে ফেলে।[২৩] ইনটাক-এর সর্বভারতীয় সভাপতি মাইকেল জনের মতো ব্যক্তিও দক্ষিণ-মানভুম লোকসভা আসনে ভজহরি মাহাতোর কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন।[২৪] পরবর্তী কালে এই জেলাকে পুনরায় বঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করার আন্দোলনে এই দলটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর জন্য দলের নেতা এবং

তাঁদের অনুগামীদের বিরুদ্ধবাদীদের হাতে ঘটনা পরম্পরায় অকথ্য লাঞ্ছনা ও হেনস্থার শিকার হতে হয়। বিহার সরকারও নামিয়ে আনে কঠোর দমনপীড়নের নীতি।

ভাষার ভিত্তিতে রাজ্যগঠনের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় জাতীয় কংগ্রেসের হায়দ্রাবাদ অধিবেশনে। মাতৃভাষা ও সংস্কৃতির স্বাধীন বিকাশের স্বার্থে মানুষের বিক্ষোভ সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। জনপ্রিয় স্বাধীনতা সংগ্রামী পত্তভি শ্রীরামালুর ৫৮ দিন অনশনের পর আত্মদান এই আন্দোলনে অন্য মাত্রা এনে দেয়।[২৫] ফলে ভারত সরকার তেলুগু ভাষাভাষীপ্রধান অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য গঠন করতে বাধ্য হয়। এই রাজ্য গঠনের পর থেকে ভাষার ভিত্তিতে রাজ্যপুনর্গঠনের আন্দোলন সমস্ত ভারত জুড়ে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। মানভুমে এই আন্দোলনের গতি আরও বেড়ে যায়। টুসু এবং ঝুমুর সংগীতের সুরে নানা গান বেঁধে ছোটো ছোটো প্রচার-মিছিল চলতে থাকে জেলার সর্বত্র। নানা সভা-সমাবেশেও এই গানগুলি গাওয়া হত। ভজহরি মাহাতোর লেখা –

বিহারি ভাই, তর্‌হা রাইখতে লারবি ডাং দেখাঁই। - রং
বাংলা ভাষার দাবিতে ভাই কন ভেদের কথা নাই।
ভারত্যে ভাই-ভাইয়্যে মাতৃভাষায় রাজ্য চাই।[২৬] - টুসু গানটি সেদিনের ভাষা আন্দোলনে জেলায় প্রভূত জনপ্রিয়তা লাভ করে। এভাবেই মানভুমের সাধারণ অধিবাসীদের মাতৃভাষার আবেগকে মর্মমূলে পৌঁছে দেওয়া হয়। সারা দেশে এজাতীয় আন্দোলন ও বিক্ষোভের ফলে 'রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন' গঠন করে ভারত সরকার।[২৭]

বিহার প্রদেশের অধীনে থাকার সময় মানভুমের জনগণনা ১৯৪১ এবং ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দেও হয়। তাতে এর আগের জনগণনাগুলির সঙ্গে এই দুটির তুলনা করা হলে অস্বাভাবিকতা চোখে পড়ে। মূলত তৎকালীন ধানবাদ মহকুমা এলাকায় ওই দুই খ্রিস্টাব্দের আদমশুমারিতে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের অনুপাত আগের তুলনায় যেমন একদিকে অনেক কমে গেল, তেমনি অন্যদিকে অনেকটাই বেড়ে গেল হিন্দি ভাষাভাষী মানুষের সংখ্যার অনুপাত। এর পেছনে আগ্রাসী হিন্দিবাদীদের হাত ছিল বলেই জানা যায়। চল্লিশের গোড়া থেকেই তাঁরা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছোনোর জন্য তাঁদের কর্মতৎপরতা তুঙ্গে তুলে দেন। ধানবাদের নিরসা, চিরকুন্ডা, গোবিন্দপুর, বেলিয়াপুর প্রভৃতি গ্রামাঞ্চলের বাংলা উপভাষার ভাষিক অধিবাসীদের বোঝানো হয়েছিল যে, তাঁরা পরবর্তী জনগণনায় নিজেদের হিন্দিভাষী বলে পরিচয় দিলে তাঁদের অনেক সুযোগসুবিধা দেবে সরকার। প্রলোভনের পাশাপাশি অন্য দিকে ভাষা ও সংস্কৃতিসচেতন বাঙালিদের ওপরে ভয়ভীতির পরিবেশ তো ছিলই। ফলে ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের জনগণনার রিপোর্টেই হিন্দিভাষার প্রতি বিহার সরকারের নির্লজ্জ পক্ষপাত ধরা পড়ে যায়।[২৮] সরকারি তথ্য ও অন্যান্য বাধ্যবাধকতার কারণে ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের জনগণনাকে ভিত্তি করে কমিশন সমগ্র ধানবাদ মহকুমাসহ পুরুলিয়া সদরের চার থানাকে নিয়ে মোট ১১টি থানা বিহারে রাখার এবং জেলা সদরের অবশিষ্ট ২০টি থানা পুনরায় পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করার সুপারিশ করে।[২৯] এছাড়াও উত্তরবঙ্গের সীমানাসংলগ্ন

বিহারের বেশ কিছু এলাকাকেও এই প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত করার সুপারিশও ছিল কমিশনের। এই ঘটনায় বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি রীতিমত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বিহার প্রদেশের অনেকটা অংশ পশ্চিমবঙ্গে চলে যাওয়ার আশঙ্কায় সেখানকার মানুষ উগ্র প্রাদেশিকতার বিষাক্ত প্রচারে নেমে পড়েন। সীমা-কমিশন ও সংসদের 'রাজ্য পুনর্গঠন সাব-কমিটি'র সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ১৭ জানুয়ারি, ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে বিহারে হরতালও পালিত হয়।

অপর পক্ষে বিহার ও আসামের সমস্ত বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলকে সীমা-কমিশন পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করার সুপারিশ না করায় এই রাজ্যের জেলায় জেলায় ভাষা আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। চলে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে গ্রেপ্তারবরণ, পিকেটিং এবং স্বাক্ষরসংগ্রহ অভিযানের লাগাতার কর্মসূচি। বাংলা ভাষাভাষী মানুষের সাংস্কৃতিক আকাঙ্ক্ষাকে সীমা-কমিশন উপেক্ষা করায় ২১ জানুয়ারি, ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে মানভুমসহ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে সর্বাত্মক হরতাল ও অরন্ধন পালিত হয়।[৩০] প্রতিবেশী দুই রাজ্যের মানুষের মধ্যে যুযুধানের মূর্তি দেখে দুই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিচলিত হয়ে পড়েন। এই দুটি রাজ্য মিলিয়ে 'পশ্চিমবঙ্গ-বিহার যুক্তপ্রদেশ' অথবা 'পূর্বপ্রদেশ' করার এক কিম্ভূত-কিমাকার প্রস্তাব তাঁরা যৌথভাবে দেওয়ায় মানভুমসহ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের ভাষা-আন্দোলনের গতি আরও দুর্বার হয়ে ওঠে। প্রস্তাবের প্রতিবাদে ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবাংলায় স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালিত হয়।[৩১] সংগ্রামকে সঠিকভাবে চালিত করতে গঠন করা হয় সংযুক্তিবিরোধী কমিটি। কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন মোহিত মৈত্র। মূলত এই কমিটির নেতৃত্বেই প্রায় তিরিশ হাজার সত্যাগ্রহী বাংলা-বিহার সংযুক্তিকরণ-বিরোধী আন্দোলনে আইন অমান্য করেন। এর জন্য এঁদের অনেককে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে কারাবরণকারী রাধারানি দেবী তাঁর জীবনের শেষ বেলায় এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে আইন অমান্য করেন। তাঁকেও গ্রেপ্তার করা হয়। আইন অমান্য করে গ্রেপ্তার হন চারুবালা বসুও। শ্রীমতী বসু এর আগে গান্ধিজির আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে কারাবন্দি হন।[৩২] মানভুমের ১০০৪ জন সত্যাগ্রহীর নামও লিপিবদ্ধ হয়ে আছে গ্রেপ্তারের তালিকায়। 'লোকসেবক সংঘ'-এর নেতৃত্বে ২০ এপ্রিল পাইকবিড়রা গ্রাম থেকে ভোরের বেলা পদব্রজে কলকাতার অভিমুখে যাত্রা করেন তাঁরা। গ্রীষ্মের প্রখর দাবদাহ উপেক্ষা করে ৬ মে কলকাতায় পৌছান। ৭ ও ৯ মে ডালহৌসি স্কোয়ারে আইন অমান্য করলে তাঁদেরও গ্রেপ্তার করা হয়।[৩৩] সংযুক্তিপ্রস্তাবের ওপরে দাঁড়িয়েই 'কলকাতা উত্তর-পশ্চিম' লোকসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে সংযুক্তিবিরোধী কমিটির প্রার্থী মোহিত মৈত্র জাতীয় কংগ্রেস প্রার্থী অশোক সেনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এই ভোট হয়েছিল ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের ৩০ এপ্রিল। ভোটের ফলে দেখা যায় অশোক সেন মোহিত মৈত্রের কাছে বিপুল ভোটে পরাজিত হন। মানুষের জাগ্রত চেতনার প্রতি মর্যাদা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ৩ মে সংযুক্তিপ্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেন।[৩৪] শেষ পর্যন্ত সংসদের

'রাজ্য পুনর্গঠন সাব-কমিটি'র এক অমর্যাদাকর প্রস্তাবের খাড়া ডাঃ রায়ের ওপর নেমে আসে। কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী পটমদা, ইচাগড়, চান্ডিল ও চন্দনকিয়ারি থানা পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কথা। প্রশাসনিক চাপের কাছে মাথা নত করে এই এলাকাগুলির দাবিও তিনি ছেড়ে দেন। ফলে মানভুমের পরিণতি হল খুবই করুণ। ছিল ঢেঁকি হল তুল, ছুলতে ছুলতে এই জেলা নির্মূলে পরিণত হয়। আগের রাজনৈতিক মানচিত্র আর থাকল না। জেলার উত্তর প্রান্তের ধানবাদ মহকুমার সঙ্গে চাস ও চন্দনকিয়ারি থানা যুক্ত হয়ে নতুন জেলা ধানবাদ নামে থেকে গেল বিহারে। জেলার দক্ষিণ প্রান্তের পটমদা, চান্ডিল ও ইচাগড় থানা তিনটিকে জুড়ে দেওয়া হয় বিহারের সিংভুম জেলার সঙ্গে। আর জেলার মধ্যাংশের ১৬টি থানা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের নতুন জেলা পুরুলিয়া নামে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে ১ নভেম্বর আত্মপ্রকাশ করে। মানভুমের মোট ২৪২৪ বর্গমাইল এলাকা আসে পশ্চিমবঙ্গে। অবশিষ্ট ১৭০৫ বর্গমাইল এলাকা কিন্তু বিহারেই থেকে যায়। কেন্দ্রীয় সরকারের অনিচ্ছা সত্ত্বেও সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সংগ্রামের ফলে 'রাজ্য পুনর্গঠনের নীতি' পশ্চিমবঙ্গে আংশিকভাবে পালিত হয়।[৩৫] পুরুলিয়া জেলা হল সেই সময় কালের মানভুমসহ পশ্চিমবঙ্গের সর্বস্তরের অগণিত মানুষের এক ঘামঝরা সংগ্রামের ফসল। ৪৪ বছর পর ছিন্ন অবস্থায় মানভুম ফিরে আসে বাংলায়। তাকে স্বাগত জানিয়ে নরেন্দ্র দেব এবং রাধারানি দেবী যে কবিতা লিখে পাঠান তা নিচে উল্লেখ করা হল।

সুস্বাগতম

বহু মানে আজ মানভূমে মোরা
    এই শুভদিনে নিলাম বরি,
ধন্য হলেন জননী আবার
    হারানো তনয় বক্ষে ধরি।
জয় গৌরবে এসেছে ফিরিয়া
    সন্তান তার আপন গেহে,
ছিন্ন অঙ্গ দেশমাতৃকা
    দেখা দিল পুনঃ পূর্ণদেহে।
জানি, জানি, যাহা রয়ে গেল বাকি
    মাতৃভাষার ঐক্য তীরে,
তোমাদের দৃঢ় সাধনার বলে
    একদা তাহাও আসিবে ফিরে।[৩৬]

টীকা ও সূত্রনির্দেশ

১. Birendrakumar Bhattacharya *et al*, প্রাগুক্ত। পৃ. ৯৬, ৯৯

" The regulation (XVIII of 1805) created a new district, called the Jungle Mahals, ...The district thus formed was composed of 23 parganahs and mahals of which 13 including Panchet were transferred from Birbhum ; 3, namely Senpahari, Shergarh and Bishnupur (except the police circle of Kotulpur) were transferred from Bardhaman and 7, namely Chhatna, Supur, Ambikanagar, Simlapal, Bhalaidiha, Barabhum and Manbhum were transferred from Medinipur. The headquarters of new district was situated at Bankura."

" In 1770, Birbhum, Vishnupur and Panchet were joined together to form a single revenue district under one Supervisor or Collector and Alexandar Higginson was appointed the first Supervisor."

পাঁচেট ঃ জঙ্গলমহল অঞ্চলে প্রথম জেলা। ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে ১৯ জানুয়ারি পঞ্চকোট রাজ্যকে নিয়ে এই জেলাটি গঠিত হয়। সদর কেন্দ্র ছিল রঘুনাথপুর। দ্র. দিলীপকুমার গোস্বামী, মানভূমের ভাষা আন্দোলন ও পুরুলিয়ার বঙ্গভুক্তি।২০০৬, পৃ. ৫

২. তরুণদেব ভট্টাচার্য, পশ্চিমবঙ্গ দর্শন - মেদিনীপুর। ১৯৭৯, পৃ. ২৬

L. S. S. O' mally (I. C. S.), প্রাগুক্ত। পৃ. ৪০

৩. Birendrakumar Bhattacharya *et al*, প্রাগুক্ত। পৃ. ২৯৮

৪. প্রভাতাংশু মাইতি, ভারতের ইতিহাস। ১৯৯৯, ১০ম সং। পৃ. ২১৮

৫. তরুণদেব ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত। ১৯৮২, পৃ. ১৪২-১৪৩

L. S. S. O' mally (I.C.S.), Bengal District Gazetteers, Bankura. 1995, p.p. 41-42

৬. H. Coupland (ed.), প্রাগুক্ত। পৃ. ৬১-৬৪

৭. তরুণদেব ভট্টাচার্য, পশ্চিমবঙ্গ দর্শন-৩ পুরুলিয়া। ১৯৮৬, পৃ. ২১

"...The nature of disturbances which recently prevailed in various parts of these districts. (Ramgarh, Jungle Mahals and Medinipur — Writer) and the character of the inhabitants which render it expedient to separate these tracts from those districts..."_ Preamble to Regulation XIII of 1833.

৮. H. Coupland (ed.), প্রাগুক্ত। পৃ. ৬৫

৯. তদেব, পৃ. ৬৫

১০. P.C. Roychoudhuri, Bihar District Gazetteers, Dhanbad. 1964, p.p. 53, 69

'প্রথমে মহকুমাটির সদর কার্যালয় ছিল গোবিন্দপুর থানার বাঘশুমা গ্রামে। পরে গোবিন্দপুর থানা থেকে ধানবাদে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।' - এই বঙ্গানুবাদ লেখকের।

H. Coupland (ed.), প্রাগুক্ত। পৃ. ২৭১

" Dhanbaid Sub-division — Known till July 1908 as the Gobindpur Sub-division, is the northern sub-division of the district....with an area of 803 square miles."

১১. তরুণদেব ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত। ১৯৮৬, পৃ. ১৬৭-১৬৮

H. Coupland (ed.), প্রাগুক্ত। পৃ. ৬৫-৬৬

Arabinda Samanta *et al* (Centre for Interdisciplinary studies, B.U.) (ed.),

Revolt of 1857 : Memory Identity History. 2009, p.p. 247-248

১২. তরুণদেব ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত। ১৯৮৬, পৃ. ৩৩
তরুণদেব ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত। ১৯৮২, পৃ. ৩৭৪
Birendrakumar Bhattacharya *et al*, প্রাগুক্ত। পৃ. ১০৩-১০৪

১৩. তরুণদেব ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত। ১৯৮৬, পৃ. ২৩

১৪. Birendrakumar Bhattacharya *et al*, প্রাগুক্ত। পৃ. ১০৪

১৫. তরুণদেব ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত। ১৯৮৬, পৃ. ২৪
" The whole district of Manbhum and Dhalbhum of Singbhum district are Begali speaking and they should go to Bengal."

১৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলি (চতুর্দশ খণ্ড-প্রবন্ধ)। ১৩৬৮, জন্মশতবার্ষিক সং। পৃ. ৪৫৫

১৭. তরুণদেব ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত। ১৯৮৬, পৃ. ২৪
" Government Letter No. 5109, R-S-138 dated 7 August 1918. এর মধ্যে গোবিন্দপুর মহকুমা ধানবাদ মহকুমায় রূপান্তরিত হয়েছিল।"

১৮. বিপান চন্দ্র, অমলেশ ত্রিপাঠী ও বরুণ দে (অনু. - ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়), স্বাধীনতা সংগ্রাম। ১৯৯১, পৃ. ১৭৭, ২৩৫
তরুণদেব ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত। ১৯৮৬, পৃ. ২৪

১৯. তদেব। ১৯৮৬, পৃ. ২৫
বিহারে কংগ্রেস ১৯৩৫ সালের ১ আগস্ট মন্ত্রীসভা গঠন করেছিল। হিন্দি ভাষা প্রচার ও প্রসারের জন্য 'মানভূম বিহারী সমিতি' গঠিত হয়েছিল। সভাপতি ছিলেন ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ। এই সমিতির পালটা সংস্থা ছিল 'মানভূম সমিতি'। এই সংস্থাকে 'বাঙ্গালী সমিতি'ও বলা হত। ব্যারিস্টার সি. আর. দাস ছিলেন এর সভাপতি। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ১৮ মে সমিতির মুখপত্র প্রথম প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন অন্নদাপ্রসাদ চক্রবর্তী।

২০. দিলীপকুমার গোস্বামী, মানভূমের ভাষা আন্দোলন ও পুরুলিয়ার বঙ্গভুক্তি। ২০০৬, পৃ. ১৪, ১৫, ২০, ২১, ৭৮, ৭৯
পুরুলিয়ার বঙ্গভুক্তির ৫০তম বর্ষ উদ্‌যাপন সংখ্যা।১৪১৩, পৃ. ২, ৩। (প্রাসঙ্গিক নিবন্ধ : অভিজ্ঞতার আলোকে ভাষা আন্দোলনের দিনগুলি। লেখক - শিশির গুপ্ত)। শিশির গুপ্ত মানভুমের ভাষা আন্দোলনের একজন আপোষহীন যোদ্ধা। সেই সময়ের উগ্র প্রাদেশিকতা ও জাতপাতভিত্তিক সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-প্রচারের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা সাক্ষাৎকারেও (৬/৪/২০০৮) লেখককে তিনি জানান।

২১. দিলীপকুমার গোস্বামী, প্রাগুক্ত। পৃ. ২৩-২৮
৩০এপ্রিল-৫মে, ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে অধিবেশন হয়েছিল বান্দোয়ান থানার জিতান গ্রামে। ভাষা-সংক্রান্ত প্রস্তাবটি নিয়ে মতপার্থক্য দেখা দেওয়ায় এটি নিয়ে পরবর্তী অধিবেশনে বিস্তৃত আলোচনা হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়। ৩০-৩১ মে, ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে শিল্পাশ্রমে পরবর্তী অধিবেশন বসে।

২২. বিভূতিভূষণ দাসগুপ্ত (সম্পাদক), মুক্তি (সাপ্তাহিক পত্রিকা), ৯ম বর্ষ ২৫শ, ৭ই জুন ও ৯ম বর্ষ ২৮শ ২৮শে জুন সংখ্যা ১৯৪৮। পুঞ্চা থানার পাইকবিড়রা গ্রামে ১৩-১৪ জুন, ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে অধিবেশন বসে।

২৩. দিলীপকুমার গোস্বামী, প্রাগুক্ত। পৃ. ৫৭-৫৮

২৪. দিলীপকুমার গোস্বামী, প্রশ্নোত্তরে মানভূম-পুরুলিয়া। ২০০৭, পৃ. ৬৫-৬৮

মাইকেল জনের পরাজয় প্রসঙ্গে সেই সময়ের নানা অভিজ্ঞতার কথা ভাষা-আন্দোলনের সৈনিক সর্বেশ্বর মাহাতোও (কুমির, থানা - কমলপুর, পূর্ব সিংভুম) লেখককে সাক্ষাৎকারে (২৪/০৫/২০০৮) জানান।

২৫. তরুণদেব ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত। ১৯৮৬, পৃ. ২৮। জাতীয় কংগ্রেসের হায়দ্রাবাদ অধিবেশন হয়েছিল ১৯৫৩ সালের জানুয়ারি মাসে।

২৬. গানটির এই অংশ কাশিপুর মাইকেল মধুসূদন কলেজের অধ্যাপক ড. ক্ষীরোদচন্দ্র মাহাতোর কাছ থেকে সংগৃহীত। তিনি প্রয়াত ভজহরি মাহাতোর নিকট আত্মীয়।

২৭. তরুণদেব ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত। ১৯৮৬, পৃ. ২৯

The States Reorganisation Commission গঠিত হয়েছিল Govt. of India, Home Affairs -এর Resolution No. 53/69/53 — Public, dated 29 December 1953 অনুসারে। সদস্য ছিলেন, Saiyad Fazl Ali — Chairman, Hriday Nath Kunzru — Member ও Kavalam Mahava Panikkar — Member.

২৮. অজিত রায়, ধানবাদ ইতিবৃত্ত। ২০০৭, ২য় সং। পৃ. ১৬

এই জনগণনায় বাংলাভাষীর হার ৬০% থেকে কমিয়ে ১০% আর হিন্দিভাষীর হার ৩০% থেকে বাড়িয়ে ৮৩% করে দেওয়া হয়েছিল। ১৯৫১ সালের জনগণনায় ধানবাদ মহকুমায় সর্বমোট ৭,৩১,৭০০ জন মানুষের মধ্যে হিন্দিভাষীর সংখ্যা ছিল ৪,৭৫,৫৪৩ জন। বাংলাভাষী ছিলেন ১,৬৬,০৬৩ জন।

২৯. দিলীপকুমার গোস্বামী, মানভূমের ভাষা আন্দোলন ও পুরুলিয়ার বঙ্গভুক্তি। ২০০৬, পৃ. ৯৪-৯৫

৩০. তদেব, পৃ. ৯৯

৩১. তদেব, পৃ. ১০১

৩২. জ্যোতি বসু, জনগণের সঙ্গে (২য় খণ্ড)। ১৯৯১, পৃ. ৩২-৩৫

৩৩. দিলীপকুমার গোস্বামী, প্রাগুক্ত। পৃ. ১০৫-১০৬

৩৪. শ্যামল চক্রবর্তী প্রমুখ (সম্পাঃ), জ্যোতি বসুর নির্বাচিত রচনা সংগ্রহ (১ম খণ্ড)। ২০০২, পৃ. ১২২

৩৫. দিলীপকুমার গোস্বামী, প্রাগুক্ত। পৃ. ৯৭, ১০৯

পশ্চিমবঙ্গ বিহারের কাছে ১৩,০০০ হাজার বর্গমাইল ভূমি দাবি করেছিল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গকে দেওয়া হয়েছিল মাত্র ২,৫০০ বর্গমাইল।

৩৬. বিভূতিভূষণ দাসগুপ্ত (সম্পাদক), প্রাগুক্ত। ১৭শ বর্ষ, ১লা নভেম্বর সংখ্যা। ১৯৫৬, পৃষ্ঠার স্থান কাটা।

-০-

★ *লেখক খাতড়া আদিবাসী মহাবিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক এবং ভাষা বিশেষজ্ঞ।*